OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 264 - 271
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মানব জীবনের ইতিহাসে তন্ত্রের উদ্ভব : আলোচনায় ‘স্থাবর’ উপন্যাস

সুস্মিতা দে
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : susmitadey7031@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Man, History, Creation, Tantra, Sanskar, Purusha, Prakriti, Shakti, Adiyuga.

Abstract
The backdrop of Bonophool's novel "Sthabar" encompasses the ancient history of humanity and the evolution of civilization. It intertwines thousands of years of human history with traditions, customs, rituals, and characteristics. The novel also highlights how primal natural forces have become spiritual inspirations for worship and devotion in human life. From the very onset of human existence, the emergence of Shakti Pradhan Tantra Shastra has been evident. Therefore, the relationship between Tantra and human life is both ancient and intimately intertwined. In addition to anthropology, the novel profoundly explores and vividly portrays the contemplation and worship of Tantra.

Discussion

বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯শে জুলাই ১৮৯৯ ও মৃত্যু ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। তিনি একাধারে উপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার ও কবি। তাঁর লেখালেখি শুরু কৈশোর থেকেই। শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজের নাম গোপন করার জন্যই তিনি ‘বনফুল’ ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় ‘মালঞ্চ’ পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ‘শনিবারের চিঠি’তে ব্যঙ্গ কবিতা, প্যারডি কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্য জগতে নিজের আসন স্থায়ী করেন। এছাড়াও ‘ভারতবর্ষ’, ‘বিজলী’, ‘প্রবাসী’, ‘আনন্দবাজার’ প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুলের রচনা সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন –

> “বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তু সমাবেশ বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা - নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে।”[১]

বনফুল পেশায় ছিলেন ডাক্তার। কিন্তু তাঁর সাহিত্য রচনার প্রতিভা সত্যিই বিস্ময়কর। ষাটের অধিক উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, প্রত্যেকটিরই কাহিনি, প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, রীতি ও শৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন।

> "তিনি শুধু কথাশিল্পী নন; চিত্রশিল্পীও। তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। মানব সমাজ সভ্যতার অনালোকিত প্রান্তর তাঁর লেখায় প্রেরণা দেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর সাহিত্যকে ভিন্ন মাত্রা দেয়।"[২]

সুদূর অতীতের মানবজাতির ইতিহাস, সৃষ্টি রহস্য মনুষ্য ও প্রকৃতির সম্পর্ক, শক্তির বিচিত্র প্রকাশ ও ধর্ম কর্ম সংস্কৃতির আদিরূপের বর্ণনায় রচিত উপন্যাস বনফুলের 'স্থাবর' (১৯৫১)। তাঁর লেখক জীবনের চতুর্থ পর্বের উপন্যাসগুলি হল 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'ডানা'। এই পর্বের উপন্যাস গুলির উপস্থাপন রীতি সম্পূর্ণ নতুন। 'জঙ্গম' উপন্যাসের অবয়ব যেমন বৃহৎ তেমনই এই উপন্যাসের সাহিত্য সিদ্ধান্তও অভিনব। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন-

> "বইটিকে উপন্যাস বলা চলে না। বলতে গেলে মানুষের এক বিশেষ সমষ্টির চিত্রপট এক আধদিনে নয়। অনেক বছর ধরে।"[৩]

'ডানা' উপন্যাসটি প্রাণী বিজ্ঞানের জগতে বিভিন্ন পাখিদের জাতি প্রজাতিদের বিচিত্র আচার ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। 'স্থাবর' উপন্যাস রচনার আগেই 'ডানা' উপন্যাসের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ ও দ্বিতীয় খন্ড ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর 'স্থাবর' ১৯৫১ সালে প্রকাশিত। তারপর আবার 'ডানা'র তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। অর্থাৎ 'ডানা' উপন্যাসটি রচনার বাতাবরণে, লেখকের পিনদ্ধ চিত্তে 'স্থাবর' উপন্যাসের জন্ম। মানবজাতির অতীত ইতিহাসের যুগ যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'স্থাবর' উপন্যাস।

> "উপন্যাসের আকারে এই কাহিনী বলার একটু অসুবিধা আছে। কাজেই লেখককে দুটি পদ্ধতি নিতে হয়েছে। প্রথমত, একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে যে প্রথমাবধি মানব ইতিহাসের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও সভ্যতার বিকাশের একজন মানব প্রতিনিধি। চারপাশের পরিবর্তন গুলির ভেতর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে। একদিক থেকে সে ধারাবাহিক মানব চেতনা। বিশেষ স্থান কাল পাত্রে সে আবদ্ধ নয়। যুগ যুগান্তরের অসংখ্য খন্ড খন্ড জীবনের স্মৃতি বহন করে চলেছে সে। সেই স্মৃতি কথাই হয়ে উঠেছে উপন্যাস। মূলত নৃতত্বই তাঁর ঔপন্যাসিক কল্পনার উপাদান। নৃতাত্ত্বিক নির্মল কুমার বসুই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়ক। সংস্কৃতির ইতিহাসের বহু উপাদান জুগিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল কুমার দে। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই বনফুল ঋণী। নির্মলকুমার বসুকেই উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছে। উপাদান হিসাবে কোন্ কোন্ বই তিনি ব্যবহার করেছেন সেগুলির নাম নেই। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন 'আহা ঠিক মনে নাই'। থাকলে ভালো হত। উপাদান আর কল্পনার মিশেল কীভাবে কোথায় কোথায় হয়েছে তা বুঝতে সুবিধা হত। দ্বিতীয়ত, কাহিনীটিকে অন্তরঙ্গ করতে গিয়ে লেখক নায়কের জবানিতেই কাহিনী বলেছেন। অন্যভাবেও, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকেও বলা যেত। কিন্তু লেখক ব্যক্তিচেতনার প্রতিক্রিয়াতেই ইতিহাস ধরতে চেয়েছেন।"[৪]

উপন্যাসটি পাঁচ সহস্রাব্দেরও পূর্বেকার ইতিহাস বহন করে চলেছে। সৃষ্টির যে কথা কেবল ইতিহাসে স্থাবর, বনফুল সেই ইতিহাস খুঁড়ে এনে দিয়েছেন শত জলঝর্ণার ধ্বনি। কল্পনা প্রতিভায় ও শিল্পায়াসে প্রাগিতিহাসের যে পুনর্নির্বাণ সম্ভব, স্থাবর তার অপূর্ব প্রমাণ। প্রত্নসমাজের আহার্যের আহরণ ও উৎপাদনের ঐতিহাসিক প্রয়াসকে কেন্দ্রে রেখে, বন্যতা ও বর্বরতা পেরিয়ে, বন পাহাড় পাথর নদী ডিঙিয়ে, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মানবজীবনের জয়যাত্রার সরল গভীর গাথা এ উপন্যাস। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ্ম শক্তি চেতনা। পুরুষ ও প্রকৃতির কার্য ও কারণ সম্পর্ক, প্রাচীনকালের রহস্যাবৃত্ত পরিবেশে আধ্যাত্মিক দেবত্বের স্বরূপ সৃষ্টি, সর্বোপরি শক্তি কিভাবে সাধনপূজার মিলিত রূপে উদ্ঘাটিত তা সমস্তই এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে লেখক বলেছেন,

> "মানবজাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ রূপ এখনও অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইল। স্থান কাল পাত্রের সীমাবদ্ধতা সাধারণ উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে, এক্ষেত্রে তাহা নাই। কারণ যিনি এই উপন্যাসের বক্তা, বিশেষ কোন স্থান, কাল বা পাত্রে তিনি আবদ্ধ নহেন। যুগ যুগান্তরে বহু খন্ড জীবনের সংস্পর্শে তিনি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> আসিয়াছেন। তাঁহারই স্মৃতি কথা এই উপন্যাস। এ আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু ইতিহাসে এ কল্পনার সমর্থন আছে। সন্ধানী পাঠক-পাঠিকারা বর্তমানের অতি-আধুনিক প্রগতিশীল সভ্যসমাজেও হয়তো এ কল্পনার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করিবেন। বক্তাও মাঝে মাঝে সে ইঙ্গিত দিয়াছেন।"[৫]

মানবজাতি আদিম যুগে বন্য ও গোষ্ঠীবদ্ধ ছিল। চেহারাতেও ছিল বানরের প্রতিচ্ছবি। বিবর্তনের প্রথম দিককার চেহারা। তাদের গায়ে ছিল অসুরের মতো শক্তি। জলের উপর নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। 'একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ঝাকড়া ভ্রূ, ছোট ছোট চক্ষু দুইটি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারখন্ড, হিংস্রতায় জ্বলিতেছে। মুখ বুক কালো কর্কশ লোমে পরিপূর্ণ। আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু'।[৬] মনুষ্য সৃষ্টির প্রাচীন অবয়ব। সে তার নগ্ন সঙ্গিনীর সঙ্গে বন্য কামনায় মিলিত হতে গিয়ে দলপতির রোষে পড়ে এবং দলচ্যুত হয়। এই নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতার একাকী নতুন পথের দিশার উপস্থিতি দিয়ে উপন্যাসের শুরু। পরবর্তী স্মৃতি নায়ক যাকে জননী বলে জানতো তার মৃত্যু এক হিংস্র বরাহের তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে। এই বীভৎস দৃশ্য নায়কের চিন্তার সূচনা করে। সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ থেকেই মায়ের অবদান স্বীকার্য সমস্ত প্রাণীজগতে। ক্রমে তাহাই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভাবনের মূল কারণ।

তখনও গড়ে ওঠেনি একটিদলের সঙ্গে অপর দলের সদ্ভাব। একে অপরকে তারা শত্রু মনে করতো। এমনই এক ভীষণ দর্শন দলপতি জুজুমের ভয়ে নায়ককে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। এই সময় পাথর তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল।

> "শুধু অস্ত্র নয়, জীবন ধারণের প্রধান সহায়। পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিতাম, পাথরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতাম, পাথরের মধ্যেই আমরা অগ্নিকে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। নানা শত্রু পরিবেষ্টিত সেই যুগে অসহায় মানুষের পাথরই ছিল পরম সহায়। পরবর্তী যুগে পাথরই তাই আমাদের দেবতা হইয়াছিল।"[৭]

এই শক্তির আরাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাবই তো তন্ত্রশাস্ত্রের মূলকথা। যে তত্ত্ব এই উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাথরের মতো গাছও সে যুগে মানুষকে গৃহ দিত, ফল দিত, ছায়া দিত, তাই গাছও তাদের দেবতা হয়ে উঠেছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের লৌকিক তন্ত্রের ইতিহাসের পাতায় এ সত্যের প্রমাণ মেলে।

উপন্যাসে প্রথম যে নারী চরিত্রটির নাম পাই সে ইকা, জুজুমের কন্যা। নায়ক তাকে কেবলমাত্র জৈব তারনাতেই জয় করতে চেয়েছিল। ইকার সাথে সহবাসের পর অনেক যুগ কেটেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে। এবার নিদারুণ তুষার যুগ। প্রবল শীতে আত্মরক্ষার কাহিনী। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে সন্তান ও স্ত্রীকেও হত্যা করা সাধারণ এবং অতিস্বাভাবিক উচিৎ কার্যই ছিল।

> "কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে যাহা অনুভব করিতেছিলাম, তাহা ক্ষুধা। ভীষণ ক্ষুধা। আগুনে ঝলসাইয়া সঙ্গিনীর মৃতদেহের খানিকটা খাইয়া ফেলিলাম। ভারি তৃপ্তি হইল।"[৮]

সে যুগে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রশ্রয় ছিল না। করুণাও বিশেষ ছিল না, ছিল ভয় আর ভয় থেকে ভক্তি। অর্থাৎ যা কিছু মানুষের শক্তিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে তারই সাধনা করেছে মানুষ, জাণু পেতে দেবতারূপে প্রণাম করেছে। অগ্নিকে তারা পূজা করেছে আর তাদের জীবন ধারণে বাধা সৃষ্টিকারীকে দানব বা অসুর ভেবেছে। তাকে প্রতিহত করতে প্রথমে লড়াই করেছে কিন্তু প্রকৃতি যে মানুষের থেকেও শক্তিশালী তাকে তুষ্ট করার জন্য বশে আনার জন্যই নানান সাধনা হোম যজ্ঞ বলি ইত্যাদি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি সে' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটেও দেখা যায় মানব সভ্যতার প্রাচীন রূপ ধরা পড়েছে। আর্যদের ভারতবর্ষে আসার ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচিত এই উপন্যাস। এই উপন্যাসেও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার রূপ চিত্রিত হয়েছে। প্রায় দু'শো জন মানুষের একটি দল, তাদের একত্রে বাস উপত্যকায়। তাদের দলের একজন দলপতিও (নাম ভল্ল) আছেন। আইবেক্স জাতীয় ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু তাদের প্রধান খাবার। তারাও প্রাকৃতিক শক্তিকেই দৈবশক্তি অর্থাৎ দেবতা রূপে বিশ্বাস করত, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বজ্র ইত্যাদিকে তুষ্ট করার জন্য তারা যজ্ঞ করত বলি দিত।

> "ভল্ল সকলকে ডাক দিয়ে বললেন, এসো, তোমরা সূর্যপূজায় এসো।"[৯]

উপন্যাসে ইড়া চরিত্রটি অদ্ভুত ও রহস্যময়। সে থাকে নিশি গুহায়। এবং সেই গুহায় বিচিত্র সব চিত্র অঙ্কন করে। যেমন–

> "গুহার দেওয়ালে সারি সারি রেখাচিত্র। একটা সিংহকে শিকার করেছে তিন জন মানুষ। পরপর সাতটি হরিণের দ্রুত ছুটে যাওয়ার ভঙ্গি। অদ্ভূত মুখাকৃতির একজন পুরুষ শূণ্যে একটা আইবেক্সকে ধরে আছে।"[১০]

ইড়ার সঙ্গে 'স্থাবর' উপন্যাসের বৃহার মিল পাওয়া যায়। আবার গৌ এর রহস্যাবৃত কার্যকলাপ ইড়ার মধ্যেও কিছু বর্তমান। তবে উপন্যাসে নায়ক ইন্দর এর ক্রমবিবর্তন ও প্রকাশভঙ্গি গল্পের গতিশীলতায় মোড় নেয় আর্যসভ্যতার উত্থানের মধ্য দিয়ে।

কাচিনের মৃত্যুর পর আবার নতুন চলা। সমাজবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে সেযুগে হিংস্র পশু অর্থাৎ ম্যামথের মত বৃহদাকার পশু হত্যা করত মানুষ। খাদ্যের প্রয়োজনে, আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র তৈরিতে, শীতের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে এছাড়াও প্রতিহিংসার কারণেও। যেমন- জুমনির ম্যামথের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে বার করা। এরপর পুঠা, লউং, রূঠাদের নতুন সমাজে নায়কের প্রবেশ। এই সমাজে পুঠা নায়কের আশ্রয়দাত্রী। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রের পরিচয় জননীর নামে, আর দলের শক্তি বৃদ্ধি সন্তানদের সংখ্যা ও শক্তিতে। রূঠা এমনই এক জননী। তারই সন্তান-সন্ততি নিয়ে এই সমাজ। পুঠার জ্যেষ্টা ভগিনী রূঠা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাতবশতই শক্তির আদি রূপে মাতৃদেবীকে কল্পনা করা হয়। যা তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার অন্যতম ভিত্তি ও উৎস। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,

> "আর্যেতর সমাজের এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ উপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।"[১১]

ধীরে ধীরে যুগের পরিবর্তনে বংশের উদ্ভব হল। এবং কুলদেবতার বিশ্বাসও মানুষ করতে শুরু করল। যেমন - পুঠার কুলদেবতা রোমাশ গন্ডার, রূঠার কুলদেবতা জল-ভল্লুক, ডিংঘার টিট্টিভ পাখি। সেযুগেও মানুষ মুক্তি বা মোক্ষের জন্য উদগ্রীব ছিল। তবে সে মুক্তির পদ্ধতি ভিন্ন ও বীভৎসও বটে। যেমন –

> "...সেই উন্মাদনাটা অসভ্য মানবের পরলোক প্রবণতার সেই আদিম উৎসবটার পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আমিও নাচিতে ছিলাম, রূঠাও নাচিতেছিল। নাচ কতক্ষণ চলিয়াছিল তাহা মনে নাই, হঠাৎ রূঠা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেই নাচটা থামিয়া গেল। পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রূঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দিক্ষু একটা মুগুর লইয়া ছুটিয়া আসিল এবং সজোরে রূঠার মাথায় আঘাত করিল। রূঠা মরিয়া গেল। মরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাহার উপর উপুর হইয়া পড়িল এবং তাহার গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল।"[১২]

সে যুগের মানুষ রোগে ভুগে মৃত্যু হওয়াকে অপরাধ বা পাপের চোখে দেখত। তাদের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর তার মাংস সন্তানরা ভক্ষণ করার মধ্য দিয়ে সে আবার নবীন অর্থাৎ নবজন্ম পাবে।

সভ্যতার পূর্বেকার মানুষও সূর্যকে পথ প্রদর্শক রূপে বিবেচনা করতেন। সূর্য উঠে সমস্ত অন্ধকার দূর করে তাই সূর্যকে দেবতা হিসাবে ভাবার প্রবণতা বহু প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। যেমন পুঠা, রূঠা, ডিংঘার মা তাদের বলেছিল- 'যে যেদিক হইতে সূর্য উঠিয়া আমাদের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, বিপদে পড়িলে সেই দিকেই যাইতে হয়'।[১৩] এ কারণেই হিন্দু ধর্মের প্রধান পাঁচজন দেবতার মধ্যে সূর্য অন্যতম। এবং তাঁকে স্মার্ত ঐতিহ্যে ব্রহ্ম-এর সমতুল্য মনে করা হয়।

> "সূর্য ও চন্দ্র এই দুই ই বোধহয় প্রাকৃত সত্তা হিসাবে যুগে যুগে মানুষ ও বিভিন্ন জাতির মানসিকতাকে সর্বাপেক্ষা বেশি নাড়া দিয়েছে। তাই তাদের নিয়ে গল্পকথা তৈরি করারও শেষ নেই। ভারতবর্ষেই দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলিক ধর্মবিশ্বাস গোষ্ঠী বিশ্বাস এই সব থেকে বেদের নানা দেবদেবী উঠে এসেছেন। প্রকৃতির ভিন্ন কোনো অবস্থা থেকে এত বহুপ্রকার দেবদেবীর জন্ম হয়নি। আবার শুধুমাত্র বৈদিক পুরাণ কাহিনি নয়, ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতেও দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মানুষ থেকে। মর্ত্যভূমি থেকে ধীরে ধীরে তাঁদের স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে বেদে দেখা যাচ্ছে সৌরধর্মচর্চা খুব কমই আছে। চন্দ্র উপাসনার ধারা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বজ্রবিদ্যুতের কথা বহু পরিচিত। বর্ণনামূলক নৃতত্ত্ব যদি চর্চা করা যায় তাহলে মনে করতে খুব দ্বিধা হবে না যে, বহু দেবতার

> উৎসই প্রকৃতির ঘটনাবলী। বাক্যের বা ভাষার ত্রুটি থেকেই যে এঁরা দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তা নয়। যথার্থই এঁদের উৎস প্রকৃতি। প্রকৃতির এই প্রভাব শুধু যে সমাজের নিচুস্তরের মানুষের মধ্যে ছিল তা নয়, সংস্কৃত ও রুচিবান মানুষের উপরেও সমানভাবে পড়েছিল। প্রাচীন মানুষের কাছে সূর্য ও চন্দ্র অভিবাসন ও যুদ্ধযাত্রাকালে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। তাদের পশুচারণা ও পশুকুলের উপরও এর প্রভাব ছিল। তাদের চাষাবাদের সাফল্য নির্ভর করত আলোর উপর। চন্দ্রের কলা পরিবর্তন সর্বত্রই মানুষের কল্পনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল।”[১৪]

তান্ত্রিক মতেও সূর্য চন্দ্রের সাধনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মহাযানী তন্ত্রমতে বামগা ও দক্ষিণগা ইড়া-পিঙলা নাড়ী সূর্য ও চন্দ্রের কল্পিত রূপ। এছাড়া বৌদ্ধতন্ত্রের আদিত্য বা সূর্যদেব সম্পর্কে ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেছেন –

> “তিনি সাতটি ঘোড়া টানা রথে বসিয়া থাকেন। ইনি রক্তবর্ণ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে এবং বামহস্তে সূর্যমন্ডল ধরিয়া থাকেন। ইঁহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।”[১৫]

ক্রমশ তুষারের যুগ শেষ হয়েছে। বরফ গলে নদী হয়েছে। ভৌগোলিক পরিবর্তন যথেষ্ট চোখে পড়ে। নতুন অরণ্যে নতুন বাঁচার উন্মাদনা এসেছে। ক্রমে জাতিগত পার্থক্য ঘুচে লৌকিক সংস্কারের পাশাপাশি শিল্পীর সঙ্গেও (বৃহা) নায়কের সাক্ষাৎ হয়েছে। সে শিল্পী আবার যাদুকরও বটে। সে ছবি এঁকে বন্য জন্তু বশ করতে পারে, প্রকৃতির মধ্যে অলৌকিক শক্তির আদেশ পায়। শিকারকে বশ করার মন্ত্রপূত সাধনা ক্রমশ মানুষের চিন্তার গভীরতাকে ত্বরান্বিত করতে থাকে। আবার গৌ-এর মন্ত্র তন্ত্রের জোরেই শেষ হয় তিত্তির বংশ। বৃহার কন্যা জোলমাকে দেখে নায়কের যেমন ভালোবাসা জেগেছে তেমনি তাদের থেকে শিখেছে নানান কৌশল বীরত্ব প্রমাণের। বিবাহ প্রথাও চালু হয়েছে। নায়ক দলপতি হয়ে বিবাহ করেছে জোলমাকে। কিন্তু তার সঙ্গে সহবাসে রাজি নয় জোলমা। তবুও সন্তান পাওয়া সম্ভব দেবতার নির্দেশে। জোলমা বলেছে-

> “দেবতা যদি ইচ্ছা করেন কুমারীর কোলেও শিশু আসিতে পারে। বৃহা আমাকে বলিয়াছিল যে দেবতা শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়কে সন্তান দান করেন, তিনি আমাদের অরণ্যেই থাকেন। অরণ্য প্রান্তবর্তী বিশাল দেবদারু বৃক্ষে তাঁহার বাস। ওহালি একটি পাথরে ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সেই পাথর লইয়া দেবদারু বৃক্ষের নিকট অন্ধকার রাত্রে গিয়া কোনো কুমারী যদি সন্তান প্রার্থনা করে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।”[১৬]

এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও ঘটনার কাঠামো মহাভারতের কুন্তি চরিত্রের কথা স্মরণ করায়। এ কারণেই লেখক বলেছেন –

> “যে দর্শন পরবর্তী যুগে সর্বদেশের ধর্ম বিশ্বাসকে প্রভাবিত করিয়াছে, যাহা তোমাদের বেদে উপনিষদে বিশদতর রূপে ব্যক্ত, সেই অসভ্য যুগেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। অসভ্য মানবের মানসপটেই দেবতা প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারাই বৃক্ষে, নদীতে, পর্বতে, প্রস্তরে, পশুতে, পক্ষীতে, সূর্যে, চন্দ্রে এমনকি মৃত্যুর ভয়াবহতার মধ্যেও দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তদানুসারে সমাজও জীবন নিয়ন্ত্রণ করিত।”[১৭]

শেষ পর্যন্ত জোলমার সংস্কার বিশ্বাসকে অস্বীকার করে নায়ক তার সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টায় ভূমিকম্পে, বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায় সমস্ত কিছু। যে কাঠের ওপর ভেসে এসেছিল ওহালি নীলচোখ মানুষদের দেশ থেকে সেই কাঠেই ভেসে যায় আকাশকন্যা জোলমা। ঔপন্যাসিক এই কাহিনি নির্মাণে নাটকীয়তা ও রোমান্টিকতার এক সুন্দর আবহ সৃষ্টি করেছেন। নৃতাত্ত্বিক তথ্য বিবরণের বাস্তবিক ভৌগোলিক ও সামাজিক বর্ণনার সাথে সমগ্র উপন্যাসে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কার, লৌকিক অলৌকিক আস্থা, সুখ, দুঃখ ভয়, প্রেম সমস্তই সুন্দরভাবে ঋজু দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

পরবর্তী পর্বে নায়ক রূপান্তরিত হয়েছে নায়িকায়। এতক্ষন আমরা একটি পুরুষের মুখে আদিম যুগের গল্প শুনেছি এবার ঝিলম এর স্ত্রী জিতার সঙ্গে আখ্যান শুরু হয়। এরপর যে স্মৃতি নায়কের মানসপটে ধরা দেয় সেটা একটি গ্রামে দশ বছরের যুবক রূপে। এবং এই দিন তার দীক্ষা। ধীরে ধীরে তন্ত্র মন্ত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের কার্যসিদ্ধির উপায়, কুলদেবতার অর্চনা ইত্যাদি প্রকাশ হতে থাকে। আবার দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। হ্রদের মধ্যস্থলে নৌকায় গ্রামের দলপতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রূপে আবার নায়কের আগমন। এই অংশে দেখা যায় মানুষ কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনের তাগিদে ব্যর্থ হয়ে পুরোহিত জোনাফুদিন দ্বারা ঘটা করে নিয়ম মেনে পূজায় তন্ত্র মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েছেন। অবশ্য সেই পদ্ধতি সমস্তই লৌকিক মতে। তন্ত্রের সাধনার সাথে তার মিল পাওয়া যায়। শকুন পাহাড়ের গুহায় বাস করে রাহুলা। সে বিভিন্ন গোপন বিদ্যার দ্বারা তৈরি করে এক বিশেষ ধরনের তীর (সাপ ও বিছের বিষ দ্বারা) যার দ্বারা হস্তী স্বীকার করা সম্ভব। এভাবেই মানুষ নিজ শক্তিকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত করতে লাগল। গ্রহণ করল প্রাকৃতিক শক্তি প্রকৃতি থেকেই।তার সঙ্গে যুক্ত হল বিভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কার ও অলৌকিক অতিলৌকিক উপাদান, শক্তির প্রদর্শণ।

এবার নায়ক এক 'শবরী' কন্যার আশ্রয় পায়। লালচুম নামে একটি মেয়ে নায়ককে বশ করে। তার যত্নে সেবায় নায়ক প্রেমিকার মধ্যেই খুঁজে পায় জননীকে। কিন্তু একটি নরখাদক সম্প্রদায়ের কাছে নিজের শিশুসন্তান ও জন্মদাতাকে সমর্পণ করাই ছিল লালচুমের উদ্দেশ্য তাই তার এই যত্ন। লালচুমের সন্তানটি জন্মের পরেই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মা ও শিশুকে খাদ্য হিসাবে নিয়ে চলে যায়। পরে দেখা যায় পলাতক শফরী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঘটনাচক্রে একত্রিত হয়েছে। দলপতি ওবুকী মৃনতা নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে। এই সম্প্রদায়ের মানুষ মাংসাশী থেকে তৃণভোজী হয়ে পড়ে। নায়কও ওবুকীর অনুরোধে নতুন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। কৃষিকাজের প্রেরণা আসে এই তৃণবীজকে খাদ্য করার তাড়নায়। ওবুকী সূর্যপূজা করত তৃণবীজের জন্য এবং অনাবৃষ্টির জন্য মানুষের জীবন নদীকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। নদী হয়ে ওঠে তাদের কাছে দেবতা।

> "হে নদী, তুমি প্রসন্ন হও, প্রশস্ত হও, প্রসারিত জননীরা নিজেদের স্তন্যদুগ্ধ নিঙড়াইয়া কন্যা নদীর জলে নিক্ষেপ করিত। নিম্ব পুরুষরা নিজেদের শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া শোণিত অর্ঘ্যে কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইত।... আশঙ্কা হইত দেবতা বুঝি বিরূপ হইয়াছেন। বিরূপ দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমরা পূজা করিতাম, প্রার্থনা করিতাম।"[১৮]

এইখানে একটি বাছুর চুরি করতে গিয়ে নায়কের আলাপ হয় কৃষ্ণাঙ্গী শিলাঙ্গীর সঙ্গে। শিলাঙ্গী যে সম্প্রদায়ে তারা গোপালন করে গরুর দুধ খায়। এই কাহিনিতে দেখা যায় নায়কের সঙ্গে দলপতি ধবলের স্ত্রী নিনানির ঘনিষ্ঠতা। অন্যদিকে শিলাঙ্গীর প্রতি আকর্ষণ। ইতিমধ্যে ধবলের সম্প্রদায়ের সঙ্গে উল্লম্ভন সম্প্রদায়ের সন্ধি হয় যে পরস্পর খাদ্য আদান-প্রদান, বিপদে পড়লে সংঘবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি। কিন্তু ধবলের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হল। আবার নিনানির সংস্কারের বিরোধী মত বিঘাও এর। তার বিশ্বাস প্রার্থনায় যতটা শক্তির উপর ততটা নয়। এই একই কারণে রাহুলা একসময় পুরোহিত জোনাফুদিনকেও অগ্রাহ্য করে স্বামীকে ত্যাগ করে স্বাধীন দল গড়ে তুলেছিল। অর্থাৎ ভক্তিকে অতিক্রম করে শক্তির সাধনা। এই প্রত্যক্ষ পথ তন্ত্রশাস্ত্রের মূল ভিত্তি স্বরূপ। পৃথিবীর প্রাকৃতিক শক্তির রূপকে সন্তুষ্টির জন্যই এই তন্ত্রসাধনার যাগ যজ্ঞ উপাসনা হোম জপ ইত্যাদি হয়ে আসছে। প্রাচীনকালে মানুষেরা প্রকৃতির শক্তির কাছে ছিল পরাজিত তাই বিশ্বের সমস্ত প্রান্তেই গড়ে ওঠা আদিম গোষ্ঠীর পূজার আচার অনুষ্ঠান রীতি পদ্ধতির প্রাথমিক শুরুটি একই সূত্র থেকে উদ্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ তন্ত্রের তাৎপর্য ও অনিবার্যতা আদিকালের মানুষের মানসিক উদ্দীপনা ও জীবন সংগ্রামের অঙ্গ ছিল। অবশ্য প্রাচীনকালে প্রকৃতি ও মানুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের সূত্র হিসাবেই তন্ত্রের সৃষ্টি। তখন এই ধারণার সাথে এতো জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিশেষত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সাধারণ আচরিত সাধনা ও যোগসাধনাই ছিল তন্ত্রের মূল উৎপাদন ও লক্ষ্য। উত্তরকালে তন্ত্র মতের সঙ্গে দার্শনিকতা, আধ্যাত্বিক চেতনা, ধর্মভাবনার সংমিশ্রণ ঘটেছে।[১৯]
বিঘাও চরিত্রটি সম্পর্কে নায়ক বলেছে –

> "বিঘাওকে আমরা সকলেই ভয় করিতাম। কারণ সে ছিল যাদুকর। যাদুশক্তির বলে সে অঘটন ঘটাইতে পারে এই বিশ্বাস সে আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল।"[২০]

অর্থাৎ যাদুশক্তি, তন্ত্রমন্ত্রের ধারণা তার উপর বিশ্বাস মানবইতিহাসের প্রায় প্রথমপর্ব থেকেই আছে। শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়ার জন্যই তন্ত্রের সাধনা শুরু হয়েছিল। বিবর্তনের পরিণতিতে সভ্যতার ক্রমবিকাশে দুটি পথ তৈরি হয়ে গেল এই সময়পর্ব থেকেই। একটি শক্তির অন্যটি ভক্তির। একদিকে রাহুলা, কাংড়া। অপরদিকে জোনাফুদিন, ওবুকি ও ধবল। নায়কের বিচিত্র জীবন যুদ্ধের তাড়নায় দ্বিমুখী দর্শন উপস্থাপনে ঔপন্যাসিক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। দার্শনিক দ্বন্দ্ব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রেমের দ্বন্দ্বেও সঞ্চারিত হয়েছে। নিনানি ও শিলাঙ্গীকে ঘিরে। এদিকে নিনানি নিজের ভালোবাসার জন্য নায়কের (শেষ পর্বে নায়কের নামকরণ হল জংলা) জন্য সে উল্লম্ভনের বিবাহ প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছে। শিলাঙ্গীর সঙ্গে জংলার বিবাহ সে মেনে নিতে না পেরে ঈর্ষায় ধবলকে প্ররোচিত করেছে শিলাঙ্গীকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। তারপর উল্লম্ভন গোষ্ঠীর লালসার কাছে নিনানি আত্মসমর্পণ করে নায়ককে বন্দি করিয়ে সে শক্তির দ্বারা প্রেমকে জয় করতে চেয়েছে। অবশেষে মানব-ইতিহাসের যে আদি ও বিচিত্র রূপ ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তার সর্বময় সার্থক এবং সমৃদ্ধলাভ করেছে নায়ক জোলমা ও শিলাঙ্গীর প্রেমময় প্রকাশে। জোংলা তাই বলেছে–

> "আজ মনে হইতেছে যে, জোলমা ওহালির রঙীন বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে দিগন্ত সীমানায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল সেই জোলমাই বহু শতাব্দী পরে অন্ধকারে সেদিন শিলাঙ্গীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে সেদিন আমি চিনতে পারি নাই।"[২১]

'স্থাবর' উপন্যাসে নৃতাত্ত্বিক তথ্যের সঙ্গে মানুষের চেতনার বিকাশ পরিপূর্ণ রূপলাভ করেছে। তার প্রতীক বনফুল সৃষ্ট নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

> "জংলা নিনানিকে নিয়ে নীলাম্বুনদীর তীরে বিশাল অপরাজিতা বংশ স্থাপন করেছিল, তা হয়তো মিশরের প্রত্ন ইতিহাসের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে, কিন্তু অনাগত যে যুগের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা সে পথে জংলার ভারতীয় বাঙালিনি শ্যামলা প্রেমিকারও প্রতীক্ষারতা।"[২২]

'স্থাবর' প্রকৃত পক্ষেই বনফুলের এক অনন্য সৃষ্টি। মানবইতিহাস, যুগের পরিবর্তন, মানব সভ্যতার সূক্ষ্ম মননের সঙ্গে দৈবশক্তির সংযোগে উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। একারণেই সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন,

> "লেখক ধারাবাহিক কাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিবেশ বর্ণনার সাহায্যে এই অস্পষ্টরূপে উপলব্ধ মানব - অগ্রগতির রেখাচিত্রটি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ...যে গাছ, পাথর অগ্নি তাহাকে প্রকৃতির দূরন্ত ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহারাই তাহার মনে দৈবশক্তির প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছে। তাহার অন্ধ, প্রবৃত্তিশাসিত মনে দয়া মায়া কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিসমূহ ধীরে ধীরে জাগিয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করিয়াছে। অর্ধস্ফুট মানব মনের সুক্ষ বিশ্লেষণ দ্বারা এই চিত্রটি উপন্যাসধর্মী হইয়াছে। ...রচনাটি অন্ধকারময় আদিম যুগের জীবনযাত্রার উপর পরিণত ঔপন্যাসিক রীতির ও তথ্যানুযায়ী বিশ্লেষণকুশলতার বিস্ময়কর প্রয়োগের উদাহরণ রূপে উল্লেখযোগ্য।"[২৩]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, পুনমুদ্রর্ণ ২০১৯-২০, পৃ. ৩৭০
২. সামন্ত, সুবল (সম্পা) 'বনফুল সমীক্ষা' এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯
৩. সেন, সুকুমার, 'বনফুল ফুলবন', সাহিত্য লোক, কলকাতা, ১৩৯০ পৃ. ৫৮
৪. সামন্ত, সুবল (সম্পা) 'বনফুল সমীক্ষা' 'বনফুলের বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস' উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২ পৃ. ১৩-১৪
৫. বনফুল, 'স্থাবর' বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩, ভূমিকা অংশ
৬. বনফুল, 'স্থাবর' বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ৯
৭. বনফুল, 'স্থাবর' বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ১৪
৮. বনফুল, 'স্থাবর' বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ২৫
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল 'আমিই সে' জনান্তিক, ঢাকা ১০০০, ২০১৯, পৃ. ১৬
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল 'আমিই সে' জনান্তিক, ঢাকা ১০০০, ২০১৯, পৃ. ২৪
১১. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪২৩ পৃ. ৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১২. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ৫১
১৩. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ৫৩
১৪. নিগূঢ়ানন্দ, 'ঋগ্বেদের দেবতা' দেজ পাবলিশিং, কলকাতা,২০২১ পৃ. ২৩
১৫. ভট্টাচার্য, ড. বিনয়তোষ ‘বৌদ্ধদের দেবদেবী’ ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী(সম্পা) চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা ৪র্থ সং ২০১৫ পৃ. ১২৬
১৬. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ১২৮
১৭. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ১০৪
১৮. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ১৮৪-১৮৫
১৯. চক্রবর্তী, জাহ্নবী ‘প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বাঙাবীর উত্তরাধিকার’ ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৮১
২০. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ২১০
২১. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ২৬৯
২২. বনফুল, ‘স্থাবর’ বাণীশিল্প, কলকাতা, ৩য় সং ২০২৩ পৃ. ৩১০
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯-২০, পৃ. ৩৭৭

Bibliography:

ভট্টাচার্য, ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ ‘প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব’ পুস্তক বিপনি, কলকাতা ০৯
চক্রবর্তী, জাহ্নবী ‘প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বাঙাবীর উত্তরাধিকার’ ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা ৬
দাস, উপেন্দ্রনাথ ‘শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা’ (দ্বিতীয় খন্ড) বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, শান্তিনিকেতন
কবিরাজ, গোপীনাথ ‘তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত’ (১ম খন্ড) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান
Mukherjee, Ajit and Madhukhanna, ‘The Tantric way’ (Art, Science, Ritual), Thames and Hudson Ltd. London, 1977
চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর (সম্পাদনা) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলার তন্ত্র’ খোয়াবনামা, কলকাতা-০৩
chakravorty Chintaharan - 'The Tantras, studies on their religion and literature’ Punthi Pustak, Calcutta-4
দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনুবাদিত) ‘ঋগ্বেদ সঙ্গহিতা’ এলম্ প্রেস; ৬৩নং বিডন স্ট্রীট, কলকাতা
সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার ‘কল্লোল যুগ’ ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ৬
রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ‘দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য’ দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩